কম্পিউটারের কি মন আছে?

সুকান্ত দাস*

জটিল প্রশ্ন, তবুও প্রশ্নটা উঠে আসে, বিশেষতঃ যখন কম্পিউটার গ্রাস করছে পৃথিবীর সব ক্ষেত্রকে—রেলওয়ের কাউন্টার থেকে দাবার দুনিয়া পর্যন্ত। সত্যিই কি কম্পিউটারের মন আছে, বা সামনের ভবিষ্যতে কম্পিউটারও কি মানুষের মতো মনের অধিকারী হতে পারবে? আর যদি তাই হয়, তবে সেদিনের সেই.কম্পিউটার জন্ম দিতে পারবে আরেকটা 'বনলতা সেন'-এর, বের করতে পারবে ব্যাপক আপেক্ষিকতাবাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম। উঃ! ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।

তার আগে ছোট্টো করে একটা আলোচনা সেরে ফেলা যাক্—কম্পিউটার কি? অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলতে গেলে, কম্পিউটার একটি প্রোগ্রামেব্‌ল ডিভাইস (Programmable device)। বাংলা করে বললে মোটামুটি এরকম দাঁড়ায়, কম্পিউটার এমন একটি যন্ত্র, যা নির্দিষ্ট অনুক্রম অনুযায়ী কাজ করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়। মোটামুটিভাবে কম্পিউটারের দুটি অংশ—হার্ডওয়্যার (Hardware) এবং সফ্‌টওয়্যার (Software)। হার্ডওয়্যার বলতে কম্পিউটারের বিভিন্ন সার্কিট, I.C., বোতাম ইত্যাদি ভৌত বস্তুকে বোঝায়। অর্থাৎ, কম্পিউটারের যে শরীরটাকে আমরা দেখি, সেটাই হার্ডওয়্যার। অপরপক্ষে, সফ্‌টওয়্যার বলতে বোঝায় এমন একটা যা ঐ হার্ডওয়্যারের সাহায্যে নির্দিষ্ট কোনো সমস্যার সমাধান করে। সফ্‌টওয়্যারের কোনো ভৌত অস্তিত্ব নেই। আপনি তুলনা করতে পারেন মানুষের সঙ্গে। রক্তমাংসের শরীর যদি হার্ডওয়্যার হয়, তবে তার মন সফ্‌টওয়্যার। মনের নির্দেশ ছাড়া শরীর যেমন একতিলও নড়তে পারে না, তেমনি সফ্‌টওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার এক প্রাণহীন দেহ। মানুষের বৌদ্ধিক জগৎ যা যা উপাদানে গড়ে ওঠে, তার কতগুলি স্তরভেদ আছে। সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে data বা উপাত্ত, তারপরের স্তরে information বা তথ্য—বিভিন্ন ড্যাটা বা উপাত্ত নিয়ে গড়ে ওঠে কোনো তথ্য। তারপরে Knowledge বা জ্ঞান এবং সর্বোচ্চ স্তরে Wisdom বা প্রজ্ঞা। কোনো মানুষ কোনো বিষয়ে কিছু বিজ্ঞ হয়ে ওঠে, নিচের সমস্ত স্তরগুলো পেরিয়ে এক জটিল মানসিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। স্বয়ংক্রিয়তার (Automation) প্রথম যুগে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো কাজ করত কেবল উপাত্ত বা ড্যাটা নিয়ে ; পরে আধুনিক কম্পিউটার কাজ শুরু করে তথ্য নিয়ে। আর বর্তমানে তো নলেজের উপর কাজ ক'রে কম্পিউটার রীতিমতো জ্ঞানী। গড়ে উঠেছে নতুন বিষয়—Artificial Intelligence (AI)। কৃত্তিমভাবে তৈরি করা হচ্ছে বুদ্ধি ; কম্পিউটার খেলছে গ্রান্ড মাষ্টার পর্যায়ের দাবা। কিন্তু আপাততঃ ঐ পর্যন্তই। এখনো সে বিজ্ঞ হতে পারেনি। একজন মানুষেরই উদ্ভাবনী ক্ষমতা আছে ; সে ভাবতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, কম্পিউটার কি পারবে শেষ ধাপ, বিজ্ঞতায় পৌঁছোতে? রাস্তা একটাই, কম্পিউটারকে মনের অধিকারী হতে হবে। একমাত্র মনেরই ভাববার ক্ষমতা আছে, সুখ-দুঃখ অনুভূতি আছে, সে কোনো নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। আবার কম্পিউটার সেসব সমস্যারই সমাধান করতে পারে, যাকে নির্দিষ্ট অনুক্রমে বাঁধা যায়। এই নির্দিষ্ট অনুক্রমকে অ্যালগোরিদম (Algorithm) বলে। অর্থাৎ যাকে অ্যালগোরিদম বা অনুক্রমের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় কেবল তাকে নিয়ে কম্পিউটার কাজ করতে পারে। সুতরাং মন যদি অ্যালগোরিদমিক (Algorithmic) বা নির্দিষ্ট অনুক্রমে বাঁধনযোগ্য হয়, কেবল তবেই কম্পিউটারে মনের জন্ম দেওয়া সম্ভব। তাহলে সমস্যাটা এসে দাঁড়াচ্ছে, মন কি আনুক্রমিক (Algorithmic)?

হ্যাঁ, মন আনুক্রমিক

Strong Artificial Intelligence (Strong AI)-এর সমর্থকরা মনে করে, মন প্রকৃতপক্ষে আনুক্রমিক। আমাদের অনুভূতি, স্মৃতি, চিন্তা, আবেগ ইত্যাদি মানসিক ঘটনাকে একটি নির্দিষ্ট অনুক্রমে বাঁধা যায়, তা যতই জটিল হ'ক না কেন। যেমন ধরুন আপনার ক্ষিদের অনুভূতি। এ মুহূর্তে আপনার শরীরে কি পরিমাণ খাবার মজুত আছে তা যদি জানা যায়, এবং প্রতি সেকেন্ডে আপনার অভ্যন্তরে কি পরিমাণ শক্তি ব্যয় হচ্ছে জানা থাকলে, বলা যাবে ঠিক কখন আপনার ক্ষিদে লাগবে। আবার শরীরে মজুত থাকা খাবারের পরিমাণ জানাও অসম্ভব কিছু নয়। আপনি শেষ কখন খেয়েছেন, তার আগে আপনার কি পরিমাণ ক্ষিদে ছিল, আপনার খাদ্যে কি পরিমাণ ভিটামিন, প্রোটিন ইত্যাদি ছিল, তাতে শক্তির অনুপাত কি.....ইত্যাদি জানতে পারলে বলে দেওয়া যেতে পারে এই মুহূর্তে আপনার শরীরে কি পরিমাণ শক্তি মজুত আছে। আবার প্রতি সেকেন্ডে কত পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন, তাও জানা সম্ভব যদি শারীরবৃত্তিয় ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা যায়। এছাড়া, কোনো মুহূর্তে কি পরিমাণ খাবার সঞ্চিত আছে জেনে, কতক্ষণ পরে ক্ষিদে লাগছে জানা যায়, তবেই গ্রাফের সাহায্যে বলা যেতে পারে, প্রতি সেকেন্ডে শরীরের চাহিদা কত। হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভীষণ, ভীষণ জটিল। তাছাড়া ক্ষিদে পাওয়ার সঙ্গে অন্যান্য মানসিক ঘটনা, যেমন—মন খারাপ, টেন্‌সন ইত্যাদিগুলোও রয়েছে। তবে সমস্ত কিছু জানা থাকলে নির্দিষ্টভাবেই বলা যাবে ক্ষিদে কখন লাগবে। আবার Strong A.I.-এর মতানুযায়ী মন খারাপ, টেন্‌সন—এগুলোও আনুক্রমিক। সুতরাং

* চতুর্থ বর্ষ, কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড টেকনলজি, কল্যাণী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ।

মন খারাপ, টেন্‌সন কখন হবে সেটাও বলে দেওয়া সম্ভব। তাই Strong AI-এর সমর্থকেরা আশা করেছিল কিছুদিনের মধ্যে এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করা যাবে, যার মন থাকবে। যেমন ধরা যাক্, একটা ইলেক্‌ট্রনিক সিস্টেম। যখন সিস্টেমের ভোল্টেজ লেভেল +100 V তখন সিস্টেমটি তীব্র আনন্দ অনুভব করে। যখন +50V তখন সাধারণ এবং তারপর থেকে দুঃখ শুরু। এবং 0V-এ চরম দুঃখ বা সিস্টেমের মৃত্যু। ধরা যাক্, সেই সিস্টেম +50V-এ পৌঁছোলে ক্ষিদে অর্থাৎ চার্জ প্রয়োজন সেটা অনুভব করে এবং চার্জ দিতে নির্দেশ দেয়। এবং এও ধরা যাক্, তাতে সাউন্ডিং সিস্টেম আছে, যার সাহায্যে অনুভূতিগুলোর প্রকাশ সম্ভব। তাহলে এখান থেকে দেখা যায় যে, সিস্টেমটির সুখ-দুঃখ আছে, অর্থাৎ অনুভূতি আছে। সুতরাং সাধারণ মানের হ'লেও, একটি মন আছে, এবং বাস্তবে এরকম সিস্টেম করা অসম্ভব কিছুই নয়, বরং যথেষ্ট সাধারণ। এভাবেই আরো জটিল মানসিক অনুভূতিগুলোকে যন্ত্রের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা যায়। সুতরাং, এখান থেকে একটা কথা স্পষ্ট, মানুষের মন আনুক্রমিক।

না, মন আনুক্রমিক নয়

আর ঝামেলাটা শুরু এখান থেকেই। উঠল বিতর্কের ঝড়। সত্যিই কি অনুভবের অ্যালগোরিদম বা নির্দিষ্ট অনুক্রম আছে? আমাদের প্রেম, ভালোবাসা, ঘৃণা, শোক সবই একটি নির্দিষ্ট অনুক্রমে বাঁধনযোগ্য? একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। মানব এবং মানুষ—শব্দ দুটির অর্থ একই। সুতরাং, 'মানুষ মাত্রই মরণশীল' আর 'মানব মাত্রই মরণশীল' বাক্য দুটির অর্থও এক। মন যদি আনুক্রমিক হয়, তবে 'মানব' এবং 'মানুষ' শব্দ দুটোকে এক ধরেই অনুক্রমটি বাক্য দুটির মানে 'অনুভব' করবে। কিন্তু কোনো বাক্য যদি এমন হয়—'মানুষের মৃত্যু হয়, তবুও মানব থেকে যায়' (জীবনানন্দ দাস)—তবে? অনুক্রমটি যেহেতু জানে মানুষ ও মানব সমার্থক তবে তো এটাকেও এভাবে মানে করবে। মানুষের মৃত্যু হয়, তবুও মানুষ থেকে যায়। যা ঐ অনুক্রমটির কাছে একটা ভুল বাক্য—মানুষ মারা গেলে সে তো আর মানুষ থাকে না, পরিণত হয় এক পচনশীল জড় পদার্থে। অথচ কী দুর্ধর্ষ উচ্চারণ, 'মানুষের মৃত্যু হয়, তবুও মানব থেকে যায়।' বাক্যটির অসম্ভব ব্যাপ্তি অনুভূত হয় আমাদের মনের অজানা তারে। তবে কি বলা যায়, এই অনুভূতি সত্যিই আনুক্রমিক? আপাতদৃষ্টিতে ক্ষিদে পাওয়ার ঘটনা থেকে মনে হতে পারে, অনুভবকে কোনো পূর্বনির্ধারিত নিয়মে বাঁধা যায়। অথচ অনুভবের ব্যাপ্তির দিকে নজর দিয়ে কি মেনে নেওয়া যায় একে?

অ্যালগোরিদম বা অনুক্রমের বৈশিষ্ট্য হ'ল, অ্যালগোরিদম স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একই ফল দেয়। মনকে যদি আনুক্রমিক ধরে নেওয়া হয়, তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সেই অনুক্রমটি একই ফল দেবে। অর্থাৎ অনুক্রমটি মানুষের মাথায় চলে যা ফল দেয়, তা সিলিকন চিপে চলে একই ফল দেবে, পাথর বা জলের মধ্যেও যদি সেই অনুক্রমটি চালানো যায় তবেও এক ফল পাওয়া যাবে। পাথর বা জলেও তৈরি হবে প্রেম-ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ অনুভূতি! (কিন্তু সত্যিই কী মেনে নেওয়া যায় একে?) সুতরাং, এর থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায়, মন ও বস্তু পরস্পর পৃথক—মন বস্তুনিরপেক্ষ। এ সিদ্ধান্ত বিখ্যাত দার্শনিক ও গাণিতিক দেকার্তের দ্বৈতবাদের সমার্থক। দ্বৈতবাদকে মেনে নিতে হ'লে অস্বীকার করতে হয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদকে। দ্বন্দ্ব শব্দের আক্ষরিক অর্থ সংঘাত বা সংঘর্ষ। দ্বন্দ্ববাদ বা ডায়ালেক্‌টিক্স একটি দার্শনিক মতবাদ। দ্বন্দ্ববাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বলে যে, দ্বান্দ্বিকতার অস্তিত্ব সর্বত্র—বস্তুজগতে, সমাজ জীবনে, বিজ্ঞানে, মানসিক জগতে। যে কোনো ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলে তার পেছনে দুটি ভিন্নধর্মী ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, দুটি ভিন্নধর্মী ঘটনা জন্ম দেয় একটি নতুন ঘটনার, আর এই দুটি ভিন্নধর্মী ঘটনা থেকে নতুন ঘটনা সৃষ্টির মধ্যে যে প্রক্রিয়া কাজ করে সেটাই দ্বন্দ্ব। দুটি পরস্পর বিরোধী ঘটনার দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের মধ্য দিয়ে নতুন ঘটনার বা নতুন সত্যের জন্ম হয়। এটাই দ্বন্দ্ববাদের মূল সূত্র। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মানুষের মনে ঈশ্বর চিন্তার জন্ম হয়েছিল, প্রাকৃতিক ঘটনা এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করার আগ্রহ—এই দুটি ঘটনার দ্বান্দ্বিকতার ফলে। প্রকৃতিতে বিভিন্ন 'অস্বাভাবিক' ঘটনা যেমন, ঝড়, দাবানল, বন্যা ইত্যাদি ঘটছে, আর মানুষ তাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েও কারণ খুঁজে পাচ্ছে না—অর্থাৎ দ্বন্দ্ব। তার থেকেই উঠে এল ঈশ্বরের ধারণা। প্রথমে প্রধান প্রধান দেবতা ছিল ইন্দ্র (দেবরাজ), বরুণ (জলের দেবতা), পবন (বাতাসের দেবতা) ইত্যাদিরা। পরবর্তী সময়ে সামাজিক প্রেক্ষাপট পাল্টানোর সাথে সাথে প্রধান দেবতা হয়ে উঠল কৃষ্ণ, শিব, ব্রহ্ম ইত্যাদিরা। যাই হোক, দর্শনের খুব গভীরে প্রবেশ না করেও বলা যায়, আমাদের মনে গড়ে ওঠা ধ্যানধারণাগুলো বস্তু জগতের কাছে ভীষণভাবেই ঋণী। আমাদের সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের অভাব ও কিছুক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য সমাজে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আজও রয়ে গেছে। সমাজকে যদি এভাবে পরিবর্তন করা যায় যেখানে সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতার পূর্ণ প্রসার সম্ভব হবে এবং বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দূর করার মানসিকতা তৈরি হবে, তখন মৃত্যু হবে ঈশ্বরের। সেই প্রজন্ম অনুভব করবে না 'ঈশ্বরের মাহাত্ম্য'। মন যদি নির্দিষ্ট আনুক্রমিকই হয়, তবে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? অনুক্রমে দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব থাকাটাই তো অসম্ভব। কেননা, অনুক্রমের সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রতিটি ধাপ (অনুক্রমটির) পূর্বনির্ধারিত স্থির হওয়া প্রয়োজন। সেখানে দ্বান্দ্বিক পরিবর্তনের প্রশ্নই আসে না। সুতরাং মনকে বস্তুনিরপেক্ষ, স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ, মন আনুক্রমিক—ইত্যাদি ভাবার সুযোগ কোথায়?

আমাদের মন সদাপরিবর্তনশীল। আমরা কোনো অঙ্ক করতে করতে ভুলভাবে এগোই, পরে আবার তা শুধরে নিই। মন যদি আনুক্রমিক হয়, তবে কি বলব আমাদের অনুক্রমের পরিবর্তন হয়েছে? যদি তাও বলি, তাহলেও একটা সমস্যা থেকে যায়। এই যে

আমার অঙ্কটা ভুল, সেটা অনুভব করল কে? এবং সঠিকভাবে করার প্রেরণাই বা জোগালো কে? যে ঐ অনুক্রমকে পরিবর্তন করল, ঠিক-ভুল অনুভব করল সেও কি আনুক্রমিক? বেশ, তাও যদি হয়, তবে তো অনেক সময় এরকম দেখা যায় যে কোনো কিছুকে প্রথমে ঠিক মনে হ'ল, পরে নিজেই সেটাকে ভুল বলে চিহ্নিত করল। তাহলে ঠিক-ভুলের অনুভূতিটাও পরিবর্তিত হয়। এটাই বা করে কে? যে করে সে কি আনুক্রমিক?.....এভাবে প্রশ্নের ভিড় বাড়তেই থাকবে। শেষ পর্যন্ত যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় একটি অতি ক্ষমতাশীল অনুক্রম বা সুপার অ্যালগোরিদম (Super Algorithm) দ্বারা—তার ঠিক-ভুল বলে কিছু নেই—তবেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়—ঐ সুপার অ্যালগোরিদম এল কোথা থেকে? তাহলে কি ঐ সুপার অ্যালগোরিদমটি জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত? কিন্তু বিজ্ঞান তো বলে মনের উদ্ভব জন্মের পরে। তাহলে কি মনে ঐ সুপার অ্যালগোরিদমের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব? যদি ধরেও নেওয়া যায়, তা জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত, তাহলেও বলা যায় প্রথম কোত্থেকে এল সেই সুপার অ্যালগোরিদমটি? শেষ পর্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে কল্পনা করতে হয় ঈশ্বরের (!) অস্তিত্ব, যে প্রথম তৈরি করেছিল সুপার অ্যালগোরিদমটি। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। প্রশ্ন ওঠে, যদি তাই হয় তবে মন আনুক্রমিক কিনা—সেই প্রশ্নটাই বৃথা। কেননা সেক্ষেত্রে মন তো কেবল ঈশ্বরের বিচরণ ক্ষেত্র!

আর যুক্তি-তর্কের ভিড় না বাড়িয়ে, এই আলোচনার এখানেই ইতি টানা যাক্। সঙ্গে যাক্ শুধু একটি জিজ্ঞাসা—কম্পিউটার কি কোনোদিনও বিজ্ঞ হতে পারবে না?

ভবিষ্যতের ধারণা ঃ ধারণার ভবিষ্যৎ

না, মেনে নিতে পারছি না। বিজ্ঞানের অতো জটিল তর্কে না গিয়ে যদি একজন সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিষয়টা বিবেচনা করি, তবে এটা মেনে নেওয়া সত্যিই কষ্টকর যে বিজ্ঞান কোনোদিনও কম্পিউটারকে বিজ্ঞ করতে পারবে না। একদিন অনেক অঙ্ক কষে ঘোষণা করা হয়েছিল, অ্যালুমিনিয়ামের মতো ভারী কোনো বস্তু বাতাসে উড়তে পারে না। অথচ সমস্ত জল্পনা-কল্পনাকে থমকে দিয়ে আকাশে প্লেন উড়ল। কল্পবিজ্ঞানের নায়ক বহুদিন আগেই 'জলের ভিতর দিয়ে যাওয়া' এক জাহাজে করে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে। আর সেই কল্পবিজ্ঞানের কল্পনাই একদিন বাস্তব হ'ল ডুবো জাহাজের মাধ্যমে। সুতরাং আজকের কম্পিউটারকে নিয়ে এতো সব কল্পনা, হাতের-সামনে-হাজির হওয়া কিছু যুক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ইতিহাস সচেতনতার পরিচয় হবে না। হ্যাঁ, কম্পিউটার সায়েন্সের একজন ছাত্র হয়েও আমি বিশ্বাস করি, আশা রাখি, কম্পিউটার একদিন মানুষের প্রয়োজনেই বিজ্ঞ হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল কিভাবে? এই বিষয়ে আমার কিছু চিন্তাভাবনাই এখানে হাজির করব।

Random Number

'Random' শব্দটির সাথে আমরা প্রায় সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত। র‍্যানডোম বলতে আমরা বুঝি উদ্দেশ্যহীনভাবে বা খেয়ালখুশি মতো সৃষ্ট কোনো ঘটনা। সাংখ্যবিজ্ঞানে র‍্যানডোম নামবারের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, এই প্রকৃতিতে বেশির ভাগ ঘটনাই তো তৈরি হয় খেয়ালখুশি মতো। ধরুন আপনাকে আমি ১ থেকে ১০-এর মধ্যে একটি সংখ্যা বলতে বললাম। ধরা যাক্, আপনি বললেন ৭। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠে আসছে, কেন আপনি সংখ্যাটি ৭ ধরলেন? কেন ৬ বা ৮ বা অন্যকিছু নয়? আপনি ৭ এর বদলে অন্য কিছু ধরলে আমি আপনাকে একই প্রশ্ন করতাম। না, ব্যাপারটা মোটেই উড়িয়ে দেওয়ার নয়। আপনার মনে সংখ্যাটির জন্ম হয়েছে খেয়ালখুশি মতো, অর্থাৎ randomly। আবার প্রকৃতিতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যাকে আমরা র‍্যানডোম বলে আখ্যায়িত করি। তাহলে কি এই মানসিক ঘটনা এবং প্রাকৃতিক ঘটনা এক গভীর সম্পর্কযুক্ত? কোনো বস্তু সম্পর্কে ব্যক্তির ধারণা আছে বলেই বস্তুটির অস্তিত্ব ব্যক্তির কাজে বিদ্যমান—বার্কলের এ ধরনের দর্শনচিন্তা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা বস্তুর অস্তিত্ব স্বতন্ত্র, এবং বস্তুর অস্তিত্বই আমাদের মনে ঐ বস্তু সম্পর্কে ধারণার জন্ম দেয়। আমাদের মানসিক ঘটনার কারণ মস্তিস্ক কোষে ঘটে যাওয়া এক জটিল জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া। মস্তিষ্ক কোষের যাবতীয় উপাদানকে যদি বস্তু ধরা যায়, তবে এই মানসিক ঘটনার পেছনে রয়েছে বস্তুর প্রত্যক্ষ ভূমিকা। সুতরাং প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনে যেমন রয়েছে বস্তুগত উপাদান, নিয়ম, তেমনি মানসিক ঘটনার পেছনে রয়েছে তাই-ই। তাই বস্তুর সঙ্গে মানসিক ঘটনার সরাসরি কোনো যোগাযোগ নেই—এ ধরনের চিন্তা ঠিক নয়। আর এর জন্যই সন্দেহ গভীর হয়। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু কী দুর্ধর্ষ নিয়মে বাঁধা—ইলেক্ট্রনের ঘূর্ণন থেকে গ্যালাক্সির আবর্তন পর্যন্ত—আর সেখানে প্রকৃতিতে র‍্যানডোম ঘটনার কোনো নিয়ম থাকবে না?! এমন তো আমাদের অনেক সময়ই হয় যে, কোনো কাজ করতে করতে হঠাৎই সেটা বন্ধ করে অন্য কিছু করি। সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই, হ্যাঁ আপাততঃ কোনো কারণ ছাড়াই, পশ্চিমের গলিটাতে ঢুকে পড়ি। এই 'হঠাৎ'-এর পেছনে সত্যিই কোনো কারণ নেই?

হ্যাঁ, এ লাইনে ভাবার যথেষ্ট আবশ্যিকতা আছে। আমার কাছে র‍্যানডোম ঘটনা যথেষ্টই রহস্যজনক ও চিন্তার গভীর কারণ আছে বলেই মনে হয়েছে। এই মহাবিশ্ব কার্য-কারণ সম্পর্কের উপরই গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ প্রতিটি কার্য-কারণের পেছনে নির্দিষ্ট কোনো কারণ আছেই। একইভাবে, প্রকৃতিতে এই র‍্যানডোম ঘটনার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, যা নির্দিষ্টভাবেই নির্ধারণ করছে, কি হবে সেই ঘটনা (যেটা আমাদের মনে হচ্ছে র‍্যানডোম)। কিন্তু, কি সেই নিয়ম?

উপরের আলোচনার সাথে কম্পিউটারের মন থাকা বা না থাকার সম্পর্ক কি? হ্যাঁ, সম্পর্ক একটা আছে। প্রাকৃতিক ঘটনার র‍্যানডোমনেস বা খেয়ালখুশি মতো ব্যবহার এবং মানসিক ঘটনার র‍্যানডোমনেস বা খেয়ালখুশি মতো ব্যবহার—উভয়ের সাথেই বস্তুর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং 'র‍্যানডোমনেসের' নিয়ম বা কারণ (যদি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়) মানসিক ঘটনা বা মনের উপরও কার্যকরী হবে, এ অত্যন্ত সাধারণ। আর যদি সত্যি সত্যিই এমন কোনো গূঢ় নিয়ম বের করা যায়, তবে তা সমগ্র মনের স্বরূপ নির্ণয়ে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেবে। সেক্ষেত্রে কেবল কম্পিউটার জগতেরই নয়, দর্শনের অনেক গভীর সমস্যার সহজ সমাধান নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

অনুক্রম ও দ্বান্দ্বিকতা

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, অনুক্রমের দ্বান্দ্বিকতা নেই। দ্বান্দ্বিকতা নেই, সুতরাং বিবর্তনও নেই ; অর্থাৎ স্থবির। আর স্থবিরতা দূর করার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে, অনুক্রমকে দ্বান্দ্বিকতার নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে হবে। সজীবতার প্রয়োজনীয় শর্তই হচ্ছে, তার মধ্যে দ্বান্দ্বিকতা থাকতে হবে। দ্বন্দ্বহীন কোনোকিছুই অতীতে হারিয়ে যেতে বাধ্য। কেননা দ্বান্দ্বিকতাই কোনোকিছুকে সময়ের সাথে পরিবর্তিত করায়। আর মন যেহেতু সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, সুতরাং অনুক্রমকে দ্বান্দ্বিক করতে পারলে তা হবে কম্পিউটারকে মনের অধিকারী করার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কিন্তু অনুক্রমে দ্বান্দ্বিকতা থাকা তো অনুক্রমের সনাতনী সংজ্ঞা (প্রতিটি ধাপ নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক) অনুযায়ীই অসম্ভব। অনুক্রমে দ্বান্দ্বিকতা থাকা মানে, অনুক্রমটির প্রতিটি ধাপ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে পারে—কোনো ধাপই সময় নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট হবে না। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে অনুক্রমের সনাতনী সংজ্ঞাকেই পরিবর্তন করতে হতে পারে, অথবা জন্ম হতে পারে কম্পিউটার বিজ্ঞানের নতুন শাখার।

না, অনুক্রমকে দ্বান্দ্বিক করতে পারলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না, বরং সমাধানের দিকে কয়েক ধাপ এগোবে। সেক্ষেত্রে সমস্ত প্রধান মানসিক দ্বন্দ্বকে বিচার করে, প্রয়োজন অনুযায়ী এমন দ্বান্দ্বিক অনুক্রম (বা, তাকে যদি অন্য নামে অভিহিত করা হয়, তবে সেটা) গঠন করা সম্ভব, যা কৃত্তিমভাবে তৈরি করবে মন। বেশ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে তৈরি করা যাবে অনুক্রমে দ্বন্দ্ব?

কার্ল মার্ক্স আধুনিক দ্বন্দ্ববাদ বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের প্রবক্তা। মার্ক্স এবং তাঁর অনুগামীরা ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ, অর্থনীতি, সমস্ত কিছুকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে বিচার করেছেন। এবং সত্যি কথা বলতে কি, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডে অসম্ভব রকম সত্যি। জীব জগতের বিবর্তনের মূলে রয়েছে ক্রোমোজোমে ঘটে যাওয়া এক জটিল জৈবিক প্রক্রিয়া, ক্রসিংওভার। এই ক্রসিংওভার ঘটে পাশাপাশি দুটি ভিন্নধর্মী ক্রোমোজোমের বহমান দ্বান্দ্বিকতা থেকে। প্রতিটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ঘটে চলে এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, এই দ্বান্দ্বিকতার কারণ কি? কেনই বা প্রকৃতিতে এই দ্বান্দ্বিকতা চলে? এ বিষয়ে কিন্তু মার্ক্সবাদীরা নীরব। উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা (জ্যাক, দেরিদা, মিশেল, ফুকো প্রমুখরা) দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, মহাবিশ্বে কোনো একক কর্তৃত্বকারী ধারক বা নিয়ম (Master discourse) থাকতে পারে না, যা দিয়ে সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করা যায়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা দ্বন্দ্ববাদকে মহাবিশ্বের একমাত্র কর্তৃত্বকারী নিয়ম হিসেবে মনে করেন। উত্তর-আধুনিকতাবাদীরা মহাবিশ্বে বহমান ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে দেখতেই বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ কি, এ সম্পর্কে তাঁরা নীরব। সত্যিই কি কোনো নিয়ম আছে মহাবিশ্বে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনার মধ্যে? বা, আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, এই যে দ্বান্দ্বিকতা, এর কারণ কি? দ্বান্দ্বিকতার সাথে কার্য-কারণ সম্পর্কই বা কি? সত্যিই কি কোনো নিয়ন্ত্রক নিয়ম আছে এই দ্বান্দ্বিকতার পেছনে?

সঙ্গত কারণেই এসব প্রশ্নগুলো উঠে আসে। এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার অবিশ্যকতা রয়েছে সমগ্র বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রয়োজনেই। আচ্ছা, কোনো র‍্যানডোম ঘটনা এবং ঘটনার দ্বান্দ্বিকতা—এর মধ্যে কি কোনো আন্তঃসম্পর্ক আছে? অথবা দুটোর মূলেই কোনো কারণ.....? এরকম ভাবার কারণও আছে। ছোট্টো উদাহরণ নেওয়া যাক্। সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দক্ষিণের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পশ্চিমের গলিটাতে ঢুকে যাওয়ার ঘটনার কথাই ধরা যাক্। এই যে 'হঠাৎ' পশ্চিমের গলিটাতে ঢুকে যাওয়া, এই ঘটনার কিছুক্ষণ আগে এবং পরে কিন্তু আমাদের চেতন বা অবচেতনে একটা দ্বন্দ্ব চলেই, যার সঙ্গে আমাদের কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর একটা সম্পর্ক আছে। তবে তো অনুমান করা যেতেই পারে যে, তাদের মধ্যে কোনো আন্তঃসম্পর্ক আছে। জটিল প্রশ্ন। তবে এই বিষয় যথেষ্ট গবেষণার দাবি রাখে।

উপসংহারের পরিবর্তে

এতক্ষণ কম্পিউটারের মন থাকা-না-থাকা নিয়ে, তার ভবিষ্যত নিয়ে এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হ'ল। আমার কিছু বক্তব্যও পেশ করলাম। আমার ধারণায় যে যথেষ্ট দিশা রয়েছে, সে দাবী আমি করি না। শুধু একটা কথাই বলতে চাই, আমরা যেন সবাই বিশ্বাস করি, ভাবি যে সত্যিই একদিন কৃত্তিম মন তৈরি করা সম্ভব হবে। আর সেটা করতে গেলে প্রথমেই মনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হতে হবে। আমার বিশ্বাস, প্রাকৃতিক ঘটনা এবং মানসিক ঘটনার মধ্যে কোনো সাধারণ নিয়ম আছেই। আমাদের বের করতে হবে, কি সেই নিয়ম। আর তার মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে কৃত্তিম মন তৈরি করার দিকে। সেই নিয়ম কেবল কম্পিউটার বিজ্ঞানেরই নয়, পদার্থ বিদ্যা, মনোবিদ্যা সহ সমস্ত বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে।